ব্যাংক এশিয়া পিএলসি ও উন্নয়ন সমন্বয়ের যৌথ উদ্যোগে

আমাদের সংসদ

কার্যক্রমের আওতায়

বাজেট প্রতিক্রিয়া অধিবেশন

০৭ জুন ২০২৪

ব্যাকগ্রাউন্ড নোট

চ্যালেঞ্জিং এই সময়ে যথেষ্ট কৌশলের সাথেই এবারের বাজেট প্রণয়নের চেষ্টা করা হয়েছে। তাই একে আলাদাভাবেই বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করতে হবে। একদিকে ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার জেরে বৈশ্বিক অর্থনীতির টালমাটাল অবস্থা, অন্যদিকে বাংলাদেশের নিজস্ব সামষ্টিক অর্থনীতিও চ্যালেঞ্জিং সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া নতুন সরকারেরও এটি প্রথম বাজেট। সে বিচারে একেবারে শুরুতেই বলে নেয়া দরকার যে, এই প্রস্তাবিত বাজেটটি প্রাথমিকভাবে দেখে একে বাস্তবতার প্রতি অনেকটাই সংবেদনশীলই মনে হচ্ছে। একই সঙ্গে এই বাজেটটিতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আরেকটু কল্যাণমুখী হওয়ার সুযোগ যে ছিল সে কথাও সত্য।

উচ্চাভিলাষী প্রবৃদ্ধির হারের লক্ষ্যমাত্রা বাড়তি চাপ সৃষ্টি করতে পারে

বিরাজমান বিনিয়োগ খরার মধ্যে ৬.৭৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন দূরূহ। কেননা প্রবৃদ্ধিকে বলশালী করতে সরকারি ব্যয়েই মূলত ভরসা রাখতে হবে। বাড়তি ব্যয়ের চাপ না নিলে, বাজেট ঘাটতি আরও কম হতো। তাতে অন্তত দেশীয় ব্যাংকের ঋণের ওপর নির্ভরশীলতা কমতো। জিডিপির শতাংশ হিসেবে বাজেট ঘাটতি ৪.৫ শতাংশ থাকায় এই ঘাটতির অর্ধেকের বেশি মেটাতে অভ্যন্তরীণ ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে সরকারকে ১ লক্ষ ৩৭ হাজার কোটি টাকার বেশি ঋণ নিতে হবে।

বিভিন্ন মাত্রার বাজেট ঘাটতি (জিডিপির শতাংশ হিসেবে)-এর ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে সরকারের সম্ভাব্য ঋণের পরিমাণ (কোটি টাকায়)

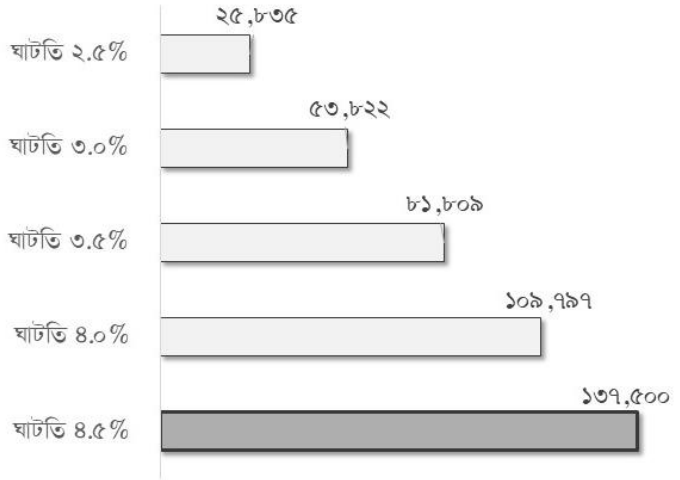

এক্ষেত্রে ঘাটতির অনুপাত কমলে বহিঃস্থ উৎস থেকে সরকার প্রস্তাবিত পরিমাণেই ঋণ নেবে বলে ধরে নেয়া হয়েছে। ফলে ঘাটতি কমলে সে অনুপাতে দেশীয় ব্যাংক থেকে ঋণের পরিমাণই কমবে।

জিডিপির শতাংশ হিসেবে ঘাটতি প্রতি ০.৫ শতাংশ করে কমানো গেলে ব্যাংকের সম্ভাব্য ঋণ প্রায় ২৮ হাজার কোটি টাকা করে কম হতে

পারে। ঘাটতি ৪.৫ শতাংশের বদলে যদি ২.৫ শতাংশ হতো তাহলে ব্যাংকিং সেক্টর থেকে ঋণ নিতে হতো মাত্র ২৬ হাজার কোটি টাকার মতো। সরকার ব্যাংক থেকে কম ঋণ নিলে, ব্যক্তি খাতের জন্য ঋণ সহজলভ্য হতো। বর্তমানে উর্ধ্বমুখি সুদ হারের প্রেক্ষাপটে তা বিশেষভাবে কাম্য। ব্যক্তি খাতে ঋণ সরবরাহ ব্যহত হলে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বাধাগ্রস্ত হয়, সর্বোপরি প্রবৃদ্ধি কম হয়।

মূল্যস্ফীতি ৬.৫ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যটিকেও বেশ চ্যালেঞ্জিং মনে হচ্ছে। কেননা, প্রায় দেড় বছর ধরে মূল্যস্ফীতি ৯ শতাংশের বেশি রয়ে গেছে। গত মে মাসে খাদ্য মূল্যস্ফীতি দশ শতাংশের বেশি এবং সার্বিক মূল্যস্ফীতিও প্রায় দশ শতাংশের কাছাকাছি ছিল। এই বাস্তবতায় এই হার সাড়ে তিন শতাংশের মতো কমিয়ে সাড়ে ছয় শতাংশে নামিয়ে আনা মোটেও সহজ হবে না। সেজন্য বাজেট ঘাটতি আরো কমিয়ে ব্যাংকিং খাত থেকে ঋণের পরিমাণ কমানোর কোনো বিকল্প নেই।

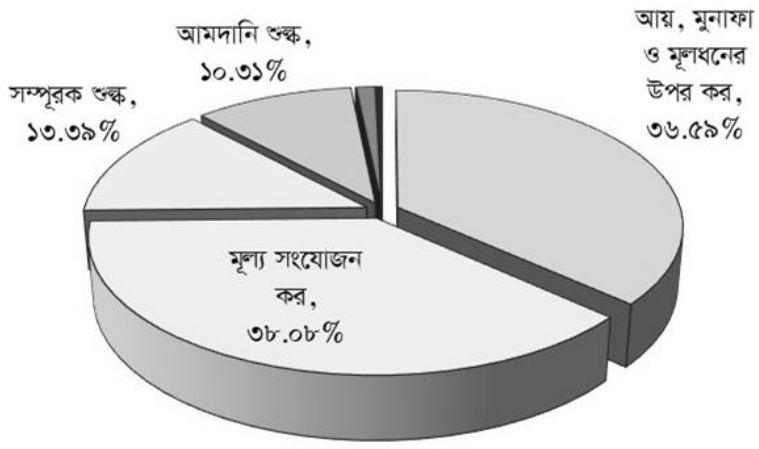

প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব বোর্ডের ৪ লক্ষ ৮০ হাজার কোটি টাকার লক্ষ্যমাত্রার বন্টন

প্রস্তাবিত বাজেটে রাজস্ব বোর্ডের ৪ লক্ষ ৮০ হাজার কোটি টাকার যে লক্ষ্যমাত্রা দেয়া হয়েছে তার মাত্র ৩৭ শতাংশের মতো আসবে প্রত্যক্ষ কর থেকে। উচ্চাভিলাষী রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা পরোক্ষ করের ওপর নির্ভরতা কমানোর পথে বাধা। রাজস্ব বোর্ড তাদের লক্ষ্যমাত্রার ৬২ শতাংশের জন্যই নির্ভর করবে পরোক্ষ করের ওপর। এক্ষেত্রে গতানুগতিকতা থেকে বেরুনো সম্ভব হয়নি। যারা কর দিচ্ছেন তাদের ওপর আর বোঝা না চাপিয়ে নতুন করদাতাদের যুক্ত করাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ জন্য রাজস্ব বোর্ডের সক্ষমতা, ডিজিটালাইজেশন-সহ পুরো রাজস্ব আহরণ কাঠামোকেই ঢেলে সাজানো দরকার।

বাজেট প্রস্তাবে বাস্তবানুগ সঙ্কোচনমুখিতা দৃশ্যমান

২০১৯-২০-এ সরকারের প্রস্তাবিত বাজেট ছিল ৫ লক্ষ ৬৮ হাজার কোটি টাকা, যা ২০২৩-২৪-এ এসে বেড়ে দাঁড়িয়েছিলো ৭ লক্ষ ৬১ হাজার কোটি টাকার বেশিতে। অর্থাৎ এ সময়কালে গড়ে বছরে বাজেটের আকার বেড়েছে ৭.৬ শতাংশ হারে। আসন্ন ২০২৪-২৫ অর্থবছরেও চলতি বছরের প্রস্তাবিতর চেয়ে বাজেট বেড়ছে। তবে আগের হারে বাড়েনি। মাত্র ৪.৬ শতাংশ বেড়ে ৭ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা হয়েছে। ফলে বাস্তবতার প্রতি সংবেদনশীল বাজেট-প্রণেতারা যে সঙ্কোচনের পথেই এগুতে চাইছেন- তা দৃশ্যমান।

এবারের বাজেটে বাস্তবতার নিরিখে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি তথা এডিপিতে বেশি বেশি প্রকল্প বাবদ ব্যয় বরাদ্দ না রাখার পরামর্শ ছিল। সাম্প্রতিক পাঁচটি অর্থবছরে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৭ শতাংশ করে এডিপির আকার বেড়েছে। কিন্তু নতুন অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দ চলতি অর্থবছরের প্রস্তাবিতর চেয়ে বরাদ্দ মাত্র ২ হাজার কোটি টাকা বাড়িয়ে ২ লক্ষ ৬৫ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে। অর্থাৎ চলতি বছরের প্রস্তাবিতর চেয়ে আসছে বছরের এডিপি বরাদ্দ বেড়েছে ১ শতাংশেরও কম। কাজেই নতুন নতুন উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়ার সময় আসছে বছরের জন্য সরকার যথেষ্ট সংযমি হচ্ছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা যাচ্ছে।

সামাজিক খাতগুলোকে প্রত্যাশিত মাত্রায় ছাড় দেয়া হয়নি

শিক্ষা খাতের লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নের জন্য বাজেটে এ খাতের বরাদ্দের অনুপাত আরও বাড়ানো উচিৎ। বরাবরের মতো মোট বাজেটের প্রায় ১২ শতাংশ যাচ্ছে শিক্ষার দুই মন্ত্রণালয়ে (খাতওয়ারি বরাদ্দের বিচারে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ)। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দের ৬.৭ শতাংশ (খাতওয়ারি হিসেবে ৩য় সর্বোচ্চ) এ খাতে থাকলেও এর বড় অংশই অবকাঠামো উন্নয়নে যাচ্ছে। শিক্ষার মানোন্নয়ন ও জনশক্তির দক্ষতা উন্নয়নের চাহিদা পূরণ করতে এ খাতে আরও বাড়তি বরাদ্দ একান্ত জরুরি।

স্বাস্থ্য বরাদ্দে আরও উদ্ভাবনী কৌশল নিয়ে জনগণের ওপর স্বাস্থ্য ব্যয়ের চাপ কমানো যেত। প্রস্তাবিত বাজেটের ৫.২ শতাংশ স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। চলতি বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে এ অনুপাত ছিল ৫ শতাংশ। বরাদ্দের অনুপাত বাড়ানো গেলে লাগামহীন মূল্যস্ফীতির এই সময়ে জনগণ স্বাস্থ্য ব্যয়ের চাপ থেকে কিছুটা সুরক্ষা পেত। মনে রাখা চাই, জনগণকেই মোট স্বাস্থ্য ব্যয়ের ৬৯ শতাংশ বহন করতে হয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বাজেট বাস্তবায়নের দক্ষতার অভাবের বিবেচনায় হয়তো বরাদ্দের অনুপাত বাড়ানো হচ্ছে না। ধারণা করা যায়, জনবল বাবদ কিংবা ভর্তুকি মূল্যে বা বিনামূল্যে দেয়া চিকিৎসা সামগ্রী বাবদ বরাদ্দ বাড়ালে বাস্তবায়ন নিয়ে দুর্ভাবনার কারণ নেই।

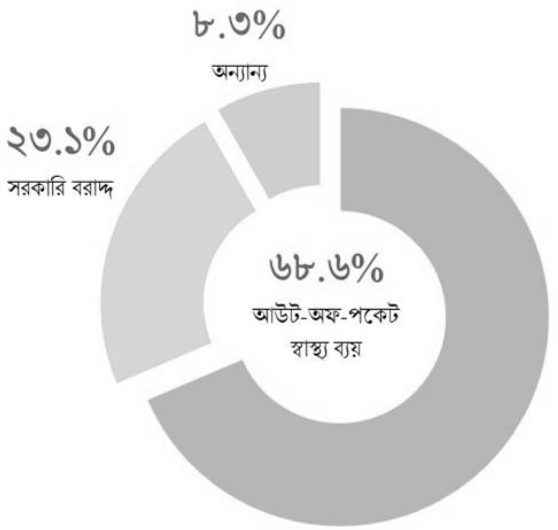

বাংলাদেশে মোট স্বাস্থ্য ব্যয় (Total Health Expenditure)-এ বিভিন্ন অংশীজনের অবদান

তথ্যসূত্র: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০২০

মূল্যস্ফীতির বিবেচনায় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির বরাদ্দে আরও উদার হওয়া যেতো। সামাজিক সুরক্ষায় বাজেটের ১৭.০৬ শতাংশ বরাদ্দ হয়েছে। চলতি বছরে ছিল ১৬.৫৮ শতাংশ। এর পুরোটাই বিপন্ন মানুষের জন্য নয়। সরকারি কর্মকর্তাদের পেনশন, সঞ্চয় পত্রের সুদ, বিভিন্ন বৃত্তির বরাদ্দও এখানে আছে। চ্যালেঞ্জিং অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রান্তিক নাগরিকদের সুরক্ষার্থে এ অনুপাত বাড়ানো যেত (বিশেষত ক্যাশ ট্রান্সফার কর্মসূচির বরাদ্দ)। বৃহত্তম ক্যাশ ট্রান্সফার কর্মসূচিগুলোর জন্য বরাদ্দ ৩ থেকে ১০ শতাংশের মতো বাড়ানো হয়েছে। অথচ মূল্যস্ফীতিই হয়েছে ১০ শতাংশের কাছাকাছি।

পরিবেশ ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ বেড়েছে ৫২ কোটি টাকা। অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রভাব হ্রাসের জন্য বিশেষ বরাদ্দ ১০০ কোটি টাকা। প্রথমবারের মতো প্রণিত 'আর্থিক ঝুঁকি বিবৃতি'তে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিগুলোকে যুক্ত করা দূরদর্শিতার প্রমাণ। লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে একযোগে কাজ করতে হবে। অ-সরকারি অংশীজনদের যুক্ততা বৃদ্ধির দিকেও নজর দিতে হবে।

কিছু কর প্রস্তাব পুনর্বিবেচনা করা জরুরি

সিগারেটে কার্যকর করারোপের মাধ্যমে বাংলাদেশে ধূমপানের হার কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় কমিয়ে আনা এবং সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধির যে সুযোগ ছিল তা কাজে লাগানো হয়নি। নিম্ন স্তরের সিগারেটের দাম আপাত বিচারে ১১ শতাংশ এবং উচ্চতর স্তরের সিগারেটগুলোর

দাম আপাত বিচারে ৪ থেকে ৭ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় নিলে কার্যত সিগারেটের দাম বাড়েনি। তবু কিছুটা হলেও দাম বাড়ানোয় সিগারেট বিক্রি থেকে আসা কর বাড়বে প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা। তামাক-বিরোধী গবেষক ও নাগরিক সংগঠনের প্রস্তাবনা বাস্তবায়িত হলে চলতি অর্থবছরের চেয়ে ১০ হাজার কোটি টাকা বেশি রাজস্ব আসতো।

আরও কিছু কর প্রস্তাব পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে। যেমন: বৈধ পথে সর্বোচ্চ ধাপের আয়ে ৩০ শতাংশ করারোপের বিপরিতে কালোটাকার ওপর তার অর্ধেক তথা ১৫ শতাংশ করারোপের প্রস্তাবটি গ্রহণীয় নয়। মূল্যস্ফীতির চাপে পিষ্ট বেশির ভাগ মানুষের আয় বিবেচনায় নিয়ে করমুক্ত আয়ের সীমা অপরিবর্তিত না রেখে আরেকটু বাড়ানোর কথাও ভাবা যায়। মোবাইল ফোনে কথা বলা ও ইন্টারনেট ব্যবহারের ওপর যে কর আরোপের কথা বলা হচ্ছে সেটিও পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে। নবায়নযোগ্য শক্তির প্রসারে সোলার সিস্টেমের জন্য প্রয়োজনীয় ইনপুটস-এর ওপর আমদানি কর যতোটা সম্ভব কমানো ও সম্ভব হলে পুরোপুরি প্রত্যাহারের কথা ভাবা দরকার।

সব মিলিয়ে প্রাথমিক বিচারে এবারের বাজেটটিকে অনেকটাই বাস্তবমুখী ও সময়োচিত হিসেবেই দেখতে হবে। তবে যেহেতু অনেকখানি কাটছাট করতে হয়েছে, তাই এই সঙ্কুচিত বাজেট বাস্তবায়নে আগের যে কোন সময়ের তুলনায় অনেক বেশি দক্ষতা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিতে হবে।

‘আমাদের সংসদ’ কার্যক্রম সম্পর্কে আরও
বিস্তারিত জানতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

উন্নয়ন সমন্বয়

ব্যাংক এশিয়া